بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২১ নভেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ২১ নবুয়্যত, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। এই সফরের আরো বিস্তারিত বিবরণ আজ বর্ণনা করব। এই উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেবার জন্য মুনাফিকদের অপচেষ্টারও উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, তাবুকের যুদ্ধের নেপথ্যে আসলে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং মুনাফিকদের একটি যৌথ ষড়যন্ত্র কাজ করছিল। যখন চারদিক থেকে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং তারা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-কে ধ্বংস করতে অসমর্থ হয়, বেশ কয়েকবার মহানবী (সা.)-কে হত্যার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন এই পরিকল্পনা তাদের একটি শেষ কৌশল ছিল। আর যদি পূর্বের মতো ঐশী সমর্থন ও সাহায্য না থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি মুনাফিকদের সফলতম প্রচেষ্টা সাব্যস্ত হতো। কারণ প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলমানদের বিনাশ একটি সুনিশ্চিত বিষয় ছিল। পূর্বেও যেসব ক্ষেত্রে তারা চেষ্টা করেছে, সেখানে আমরা এটিই দেখেছি। কিন্তু যে আল্লাহ্ বদরের ময়দানে অবিশ্বাস্যভাবে মুসলমানদেরকে সাফল্য দান করেছেন এবং এরপর হুনাইনের যুদ্ধ পর্যন্ত তাঁর অবিরাম সাহায্য ও সমর্থন মুসলমানদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করে গিয়েছে, আর মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি বিপজ্জনক মুহূর্তে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা তাঁর সাথে ছিল– প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এক্ষেত্রেও হয়েছে। মদীনা থেকে তাবুক পর্যন্ত সফর যেন মৃত্যুর উপত্যকার সফর ছিল। এই সফরে নিরাপদে তাবুক পর্যন্ত পৌঁছা এবং এরপর ফিরে আসা মুনাফিকদের হতবুদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। অধিকন্তু রোমসম্রাটের মদদপুষ্ট সৈন্যবাহিনীর পলায়ন বা ভয়ে সম্মুখসমরে লিপ্ত না হওয়া ছিল আরেকটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আর আরবের সীমান্তে বসবাসকারী সকল বিরোধী শক্তির ওপর ত্রাস সঞ্চার হওয়া, যার ফলে তাদের মধ্যে অনেকেরই মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধির অনুরোধ জানিয়ে জিযিয়া (কর) প্রদানে স্বস্তি খুঁজে নেওয়া– এই সমস্ত ঘটনা থেকে মুনাফিকদের সব ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হবার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কারণ মুনাফিকরা স্বপ্নেও ভাবে নি যে, মহানবী (সা.)-সহ কোনো মুসলমান নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসতে পারে। তাই এখন যখন ত্রিশ হাজার সেনার এই বাহিনী বিজয় ও সাফল্যের পতাকা উড়িয়ে তাদের প্রিয় রসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে মদীনায় ফেরার যাত্রা শুরু করে, তখন মুনাফিকরা তাদের তূণের শেষ তিরটি নিক্ষেপ করা জরুরি মনে করে এবং সেটি ছিল, যেভাবেই হোক, মহানবী (সা.)-কে মদীনায় পৌঁছতে দেওয়া যাবে না, নাউযুবিল্লাহ্। এর জন্য তারা তাঁকে (সা.) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। বরং এটাও অসম্ভব নয় যে, এই ষড়যন্ত্রটি আগে থেকেই শেষ আঘাত হিসেবে স্থির করা ছিল যে, প্রথমত, এই মুসলমানরা পথে বা তাবুকে মারা যাবে; আর যদি এরপরও বেঁচে গিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে, তাহলে যেন পথিমধ্যেই তাদের হত্যা করা হয়। আর এই অনুমানটি এজন্য সঠিক হবার সম্ভাবনা বেশি, কারণ মুনাফিকদের সব বড়ো বড়ো নেতা তখন সঙ্গে ছিল না; বরং মুনাফিকদের একটি দল এই বাহিনীর সাথে ছিল, যারা প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার

বিষ ছড়ানোর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করত না। কিন্তু এত বড়ো পদক্ষেপ তাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না, যদি না এই পরিকল্পনা আগে থেকে করা থাকত।

যাহোক, তারা এই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রটিকে এভাবে কার্যকর করে যে, ফেরার পথে একটি রাস্তা এমন ছিল, যেখানে উপত্যকার মাঝে দুটি পথ ছিল; একটি প্রশস্ত সমতল পথ এবং একটি সংকীর্ণ পথ, যা ছিল দুর্গম উঁচু গিরিপথের মাঝ দিয়ে যাওয়া একটি পথ। এই পথটি সংক্ষিপ্তও ছিল এবং মুসলমান সেনাদল এই গিরিপথ দিয়েই অতিক্রম করার কথা ছিল। মুনাফিকরা পরিকল্পনা করে, ঠিক যখন গিরিপথের উঁচু স্থান দিয়ে এই পুরো বাহিনী পার হবে, মানুষের ভিড় থাকবে, অনেক লোক থাকবে, তখন রাতের অন্ধকারে (সফরটি রাতের বেলা হচ্ছিল) সমস্ত মুনাফিক মহানবী (সা.)-এর উটের কাছে একত্রিত হবে এবং কোনো না কোনোভাবে তাঁর (সা.) উটটিকে জোর করে গিরিপথের কিনারার দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে এবং হাওদার দড়িগুলো কেটে দেওয়া হবে। এভাবে সেই উটটি (নাঊযুবিল্লাহ্) তাঁকে (সা.) খাদে ফেলে দেবে, গিরিপথের পাশের গর্তে ফেলে দেবে, অথবা তাঁকে (সা.) সাথে নিয়ে সেটি নিজেই খাদে পড়ে যাবে এবং রাতের অন্ধকারে এটাকে একটি দুর্ঘটনা বলে মনে করা হবে আর কারো মনে সন্দেহ জাগবে না যে, এটি ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ড।

হযরত উরওয়াহ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন তাবুক থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন, তখন মুনাফিকদের একটি দল তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করে এবং ঠিক করে যে, তাঁকে (সা.) রাস্তায় কোনো গিরিপথের চূড়া থেকে ফেলে দেবে। কিন্তু সঠিক সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করে দেন, যার ফলে তিনি (সা.) ঘোষণা করিয়ে দেন যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সঙ্গে থাকা তিনজন সাহাবী ছাড়া আর কেউ গিরিপথের দিক দিয়ে যাবে না। অর্থাৎ তিনি বলেন, শুধু আমি গিরিপথের দিক দিয়ে যাব, বাকি সবাই খোলা মাঠের দিক দিয়ে যাবে। আর তাঁর সঙ্গে থাকা সাথিদের নাম হলোঃ হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান, হযরত হামযা বিন আমর আসলামী এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের। অবশিষ্ট সৈন্যদের সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, তারা উপত্যকা সংলগ্ন প্রশস্ত মাঠ দিয়ে যাবে।

পথ পরিবর্তনের এই আকস্মিক ঘোষণায় মুনাফিকদের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেখা যায়, কিন্তু তারা তবুও তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্য কার্যকর করা থেকে বিরত হয় নি এবং দ্রুত বারো বা পনেরোজনকে নির্বাচন করে আর স্থির করে, তারা নিজেদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে নেবে এবং দ্রুত গিরিপথের দিকে এগিয়ে যাবে আর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ করে উটটিকে ধাওয়া দিতে শুরু করবে এবং সেটিকে ভয় দেখিয়ে চমকে দেবে, যেন (নাঊযুবিল্লাহ্) সেই দুর্ঘটনা ঘটে, যার আশায় তারা অধীর হয়ে ছিল।

অতএব, তারা তা-ই করে। মহানবী (সা.) যখন গিরিপথে চলছিলেন, সেই সময়েই তিনি মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান। তারা তাঁর কাছে চলে আসে এবং তাঁর উটটিকে ভয় দেখায়, যার কারণে কিছু মালপত্রও পড়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) হযরত হুযাইফাকে নির্দেশ দেন, এই মুনাফিকদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। হযরত হুযাইফা লাঠি দিয়ে তাদের বাহনগুলোকে আঘাত করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রুরা! একপাশে সরে যাও। তখন এই মুনাফিকরা বুঝে যায় যে, মহানবী (সা.) তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জেনে গেছেন। তারা যেহেতু ধরা পড়তে চাইছিল না, তাই তারা দ্রুত গিরিপথ থেকে নীচে নেমে এসে সৈন্যদের মাঝে মিশে যায়। হযরত হুযাইফা তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, হুযাইফা! তুমি আমার বাহনকে পিছন দিক থেকে

আঘাত মারো; [কারণ সেটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল;] আর হে আম্মার! তুমি এটিকে সামনে থেকে হাঁকাও, যেন সেই ভড়কে যাওয়া উটটি পুনরায় সঠিক পথে চলে আসে।

একটি বর্ণনায় আছে, হযরত হুযাইফা বর্ণনা করেন, যখন আমরা গিরিপথে পৌঁছি, তখন বারোজন লোক এই গিরিপথে তাঁর পথে বাধা দেয়। যখন আমি মহানবী (সা.)-কে অবগত করি, তখন তিনি তাদেরকে মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানান। এতে তারা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায়। মহানবী (সা.) আমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তাদের চিনতে পেরেছ? আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তাদেরকে চিনতে পারি নি। কেননা তারা মুখ ঢেকে রেখেছিল আর (তখন) অন্ধকারও ছিল। কিন্তু আমরা তাদের বাহনগুলো চিনতে পেরেছি। [আরবদের বাহন চেনার খুব ভালো দক্ষতা ছিল।] তিনি (সা.) বলেন, এরা কিয়ামত পর্যন্ত মুনাফিক থাকবে। তোমরা কি তাদের দুরভিসন্ধির ব্যাপারে জানো? [তিনি (সা.) পুনরায় এটি তাঁর সঙ্গী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন।] তারা বলেন, আমরা নিবেদন করি যে, না, আমরা জানি না। তিনি (সা.) বলেন, তারা গিরিপথে আল্লাহ্‌র রসূলকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে ফেলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। আমরা নিবেদন করি, আপনি কি তাদের গোত্রগুলোর কাছে এই বার্তা প্রেরণ করবেন না যে, প্রত্যেক গোত্র যেন নিজেদের (অপরাধী মুনাফিক) সাথির মস্তক কেটে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়? [অর্থাৎ, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়, হত্যা করা হয়।] তিনি (সা.) বলেন, না। আমি চাই না, আরববাসীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করুক যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজের জাতির (লোকদের) হত্যাকারী। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) তখনো তাঁর উটের পিঠেই আরোহিত ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। হযরত হুযাইফা (রা.) নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, ওখানে কে? তিনি নিবেদন করেন, আমি হুযাইফা। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে যাচ্ছি, তুমি এটি কাউকে বলবে না। এরপর তিনি (সা.) সেই আক্রমণকারীদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বলেন। এরপর এটিও বলেন, আমাকে তাদের জানাযার নামায পড়তে বারণ করা হয়েছে, আর তারা মুনাফিক। রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি (সা.) বারো, তেরো কিংবা পনেরোজনের নাম বলেন। মহানবী (সা.) যেহেতু হযরত হুযাইফা (রা.)-কে এ গোপন কথা কাউকে বলতে বারণ করেছিলেন, তাই হযরত হুযাইফা (রা.) কখনো কাউকে এসব নাম বলেন নি। এমনকি হযরত উমর (রা.) যখন তাঁর খিলাফতকালে এ কথা জানতে পারেন যে, তিনি (অর্থাৎ হুযাইফা) এ ঘটনার সাক্ষী আর তিনি তাদের নাম জানেন– তখন হযরত উমর (রা.) এ পন্থা অবলম্বন করেন যে, যদি কারো ব্যাপারে সন্দেহ হতো, তাহলে হযরত উমর (রা.) হযরত হুযাইফা (রা.)-কে সাথে নিয়ে তার জানাযা পড়তে যেতেন। [কারো সম্বন্ধে সেই ঘটনায় জড়িত হবার বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-র যদি সন্দেহ হতো তাহলে হযরত হুযাইফা (রা.)-র হাত ধরে সাথে জানাযা পড়তে নিয়ে যেতেন। হযরত হুযাইফা (রা.) যদি যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন তাহলে হযরত উমর (রা.) বুঝে নিতেন, সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনিও জানাযার নামাযে যেতেন না।]

সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তারা চৌদ্দ বা পনেরোজন ছিল। কিন্তু সাথে সাথে এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তাদের মাঝে বারোজন মুনাফিক ছিল যারা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অবশিষ্ট তিনজন সাহাবী যারা সে সময় গিরিপথে উঠেছিলেন, কিন্তু তারা আসলে ঘোষণাকারীর এ ঘোষণা শোনেন নি যে, এই পথের বদলে সমতলের পথ অবলম্বন করতে হবে। তাই সেই তিনজনকে নির্দোষ মনে করা হয়।

যাহোক, সকালে অওস গোত্রের নেতা হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, গত রাতে কয়েকজন মুনাফিক এই দুরভিসন্ধি করেছিল যে, তারা গিরিপথে হুযূর (সা.)-এর পিছু নেবে এবং রাতের অন্ধকারে উটের রশি কেটে দেবে এবং কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে উটটিকে খোঁচা মারবে যেন তা দ্রুতবেগে ছোটে, আর এভাবে তারা আমাকে আমার উটের পিঠ থেকে ফেলে দেবে। তখন হযরত উসায়েদ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! প্রত্যেক গোত্রকে নির্দেশ দিন, তারা যেন এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রত্যেককে হত্যা করে। আর তিনি আবেগের আতিশয্যে বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এমন লোকদের কি এভাবে (বিনা শাস্তিতেই) ছেড়ে দেওয়া হবে? আমরা আর কতকাল এদের সাথে আপস করব? অথচ আজ তারা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] সংখ্যায় নগণ্য এবং লাঞ্ছিত, আর ইসলাম দৃঢ়তা লাভ করেছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার এটা পছন্দ নয় যে, মানুষজন বলাবলি করবে– যখন তাঁর [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর] এবং মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে তখন মুহাম্মদ (সা.) নিজের সাহাবীদের হত্যা করতে আরম্ভ করেছেন। হযরত উসায়েদ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরা তো সাহাবী নয়; এরা কবে থেকে আপনার বা আমাদের সঙ্গী হলো? মহানবী (সা.) বলেন, তারা কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার সাক্ষ্য দেয় না? হযরত উসায়েদ (রা.) বলেন, নিশ্চয় দেয়, কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই; বুলিসর্বস্ব সাক্ষ্য দেয় তারা, কিন্তু তাদের অন্তর কোনো সাক্ষ্য দেয় না। তিনি (সা.) বলেন, **তারা যেহেতু কলেমার সাক্ষ্য দেয়, তা সে কেবল মৌখিকভাবেই হোক– সেহেতু আমি তাদের হত্যা করব না**। বর্তমান যুগের তথাকথিত আলেমরা, যারা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করার ফতওয়া দেয়– তাদের এই বাণীটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মদীনার মুনাফিকরা যখন জানতে পারে যে, কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নি এবং মহানবী (সা.) নিরাপদে ফিরে আসছেন, তখন তারা মনে করে, আমাদের কপটতাপূর্ণ কূটকৌশলের রহস্য মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং আমরা এখন হয়ত শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবো না। তখন তারা মদীনা থেকে কিছুটা দূরত্বে একটি খুবই সংকীর্ণ পথে কয়েকজনকে বসিয়ে রাখে, যেখান দিয়ে কেবল একজন আরোহী পার হতে পারত। মহানবী (সা.) যখন সেই জায়গার কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, সামনে পথের দুপাশেই শত্রু ওত পেতে বসে আছে। তিনি (সা.) একজন সাহাবীকে আদেশ দেন, যাও এবং সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসো। তিনি দ্রুতগতিতে তার বাহন ছুটিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং কয়েকজনকে সেখানে লুকিয়ে বসে থাকতে দেখেন যেভাবে আক্রমণকারীরা বসে থাকে। [বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েত রয়েছে। এটিও একটি রেওয়ায়েত যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন।] তিনি সেখানে পৌঁছার পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা সমীচীন মনে করেন নি। তিনি (সা.) যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন সেসব মুনাফিক যারা যুদ্ধে যোগদান করে নি– বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখাতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করে নেন। কিন্তু এখন মুনাফিকদের স্বরূপ মুসলমানদের সামনে উন্মোচন করার সময় এসে গিয়েছিল। অতঃপর তা জানিয়ে দেওয়া হয়।

যাহোক, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে কোথাও (মুনাফিকদের) ওত পেতে বসে থাকার অথবা আগে গিয়ে উপস্থিত হবার কিংবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। তবে সকল বর্ণনায় মূল ঘটনা একই। অর্থাৎ, সেই সংকীর্ণ গিরিপথে মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি

করার চেষ্টা করা হয়েছিল, নাউযুবিল্লাহ্। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের পর মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে এক প্রকার গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। তারা যখন দেখে, আরবের চতুর্দিকের বিভিন্ন গোত্র, এমনকি ইহুদীদের গোত্রগুলিও নিজেদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং বিজিত হয়েছে, তখন তারা আরবের বাইরে রোমসম্রাটের মতো পরাশক্তির কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিকল্পনা করে। আর এর পাশাপাশি তারা মদীনায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র বানানোরও পরিকল্পনা করে, যেখানে স্থায়ীভাবে তারা নিজেদের মধ্যে বৈঠকাদি করতে পারবে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করতে পারবে এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্রও মজুদ রাখবে। তবে সেই কেন্দ্রটি এমন হতে হবে, যেন অন্য মুসলমানদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহও সৃষ্টি না হয়। এমতাবস্থায় আবু আমের, যে কিছুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ করে সে আবার সামনে আসে। মুনাফিকদের পক্ষে অপপ্রচারকারীরা তাকে আবু আমের রাহেব (বা সন্ন্যাসী) বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করে। সে পরামর্শ দেয়, এই ধরনের কেন্দ্র বানানোর জন্য তোমরা কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করো। আবু আমের সম্পর্কে ইতিহাসে আরো তথ্য পাওয়া যায় যে, আবু আমের 'রাহেব' নামে সুপরিচিত ছিল এবং খাযরায গোত্রের সদস্য ছিল। যেমনটি অন্যান্য খুতবায় এ সম্পর্কে বর্ণিতও হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পর আবু আমের মক্কায় চলে যায় এবং কুরাইশকে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের জন্য উসকে দেয় আর বলে, আমি তোমাদের সাথে আছি এবং আমার জাতি আমার অনুগত। তোমরা যখন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমরা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হব। সে উহুদের যুদ্ধে কুরাইশের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল। ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে আবু আমের প্রচণ্ড চিন্তিত হয় এবং হিংসার আগুনে পুড়তে থাকে। উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে সে গর্ত খুঁড়িয়ে রেখেছিল যেগুলোর একটিতে পড়ে গিয়ে মহানবী (সা.) মারাত্মকভাবে আহতও হয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধ শুরু হলে আবু আমের নিজের গোত্রকে ডেকে বলে, হে আমার গোত্রের লোকেরা, আমি আবু আমের! কিন্তু তারা ইতোমধ্যেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা তাকে প্রত্যুত্তরে বলে, হে ফাসেক! তোমাকে কেউ স্বাগত জানাবে না। তারা তাকে তিরস্কার করে এবং অভিশাপ দেয়। তখন আবু আমের বলে, আমার পরে আমার জাতি তো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে! এরপর তার গোত্রের অনেক লোক যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি শত্রুতা রাখত– মক্কার দিকে চলে যায়। উহুদের যুদ্ধের আগেই এ ঘটনাটি ঘটেছিল; আবু আমের যখন চলে গিয়েছিল তখন যারা মুসলমান হয় নি, তারাও তার সাথে চলে গিয়েছিল; তারা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন ছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আবু আমেরের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়ার উল্লেখও পাওয়া যায়; মহানবী (সা.) তার বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলেন, সে যেন নিজের মাতৃভূমি থেকে দূরে, ভিনদেশে একাকী মৃত্যুবরণ করে। এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) যখন মদীনায় পৌঁছান তখন আবু আমের এসে তাঁর (সা.) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে জিজ্ঞেস করে, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি লোকদের কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছ? মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে 'হানীফ' (তথা ইব্রাহীমী) ধর্মের দিকে আহ্বান করছি– যে ধর্মের অনুসন্ধান করার দাবি তুমি নিজেও করে থাক। আবু আমের বলে, তুমি কি সত্যিই সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছ? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। সে হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করে। আবু আমের তাঁকে (সা.) বিদ্রুপ করে বলে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ যেন তাকে অচেনা জায়গায় ও পরবাসী অবস্থায় মৃত্যু দেন। সে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেই

এটি বলছিল। মহানবী (সা.) জবাবে বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীর সাথে এরূপই করবেন। এরপর আবু আমের নিজের গোত্রকে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে বাধা দিতে থাকে এবং তাঁর (সা.) আনুগত্য না করার জন্য চাপ দিতে থাকে। আর এদিকে মহানবী (সা.)-এর নিদর্শন ও মু'জিযাগুলো একের পর এক প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তাঁর (সা.) অনুসারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল; বিশেষত আবু আমেরের গোত্রের লোকেরাই বেশি মুসলমান হচ্ছিল। এতে সে আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সে মুনাফিকদের সাথে মিলে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মসজিদে যিরার' নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য ছিল, লোক জড়ো করে গোপনে শলাপরামর্শ করা এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এক বর্ণনা অনুযায়ী, আবু আমের তার সহযোগী ষড়যন্ত্রকারীদের বলেছিল, তোমরা একটি মসজিদ তৈরি করো ও সেটিকে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আমি রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছ থেকে বিশাল সেনাদল নিয়ে আসছি, যেন মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের মদীনা থেকে উৎখাত করা যায়। অতঃপর আবু আমের রোমান সাম্রাজ্যের দিকে রওয়ানা হয় এবং সিরিয়া গিয়ে রোমসম্রাট কায়সারের সাথে সাক্ষাৎ করে। সে তাকে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং তাদের সম্বন্ধে বলে, এরা দুর্বল, গরিব এবং সংখ্যায় কম, তাদের শত্রু বেশি। তাদেরকে ভয় পাবার তোমার কোনো কারণ নেই। সে তাকে আরো বলে, এখন সে যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে তা ভবিষ্যতে তার সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। হিরাক্লিয়াস তাকে নিজের কাছে থাকতে দেয় এবং তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই সময় আবু আমের তার সমমনা দুষ্কৃতিপরায়ণ ষড়যন্ত্রকারীদের সুসংবাদ পাঠিয়ে জানায়, অচিরেই বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করব। তাই তোমরা আমার জন্য বিশেষ এক আস্তানা তৈরি করো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুনাফিকরা কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে; এই মসজিদকে মসজিদে যিরার বলা হয়। কিন্তু তার এই মনোবাসনাও পূর্ণ হয় নি, আর পরিশেষে আবু আমের সিরিয়াতেই নিঃসঙ্গ ও পরবাসে থাকা অবস্থায় মারা যায়। সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে দোয়া করেছিল, কিন্তু দোয়া উলটো তার ওপরই আপতিত হয়। সে কবে মৃত্যুবরণ করেছে– এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। কারো মতে সে নবম হিজরীতে মারা গেছে, আর কারো মতে সে দশম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছে; তবে যেটিই হোক, সে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। মুনাফিকরা যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে তখন তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর সমীপে নিবেদন করে, তিনি যেন সেখানে নামায পড়েন। ঐশী প্রজ্ঞায় এমনটি ঘটে যে, এই লোকেরা যখন নামসর্বস্ব সেই মসজিদের উদ্‌বোধনীর আবদার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন তিনি (সা.) তাবুক যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তারা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা অসুস্থ, কর্মব্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য এবং বৃষ্টিমুখর রাতে নামায পড়ার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো, আপনি আগমন করে আমাদের জন্য এতে নামায আদায় করুন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি এখন ব্যস্ত আছি, সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। আমরা সফর থেকে ফিরে এসে সেখানে নামায পড়ব। মহানবী (সা.) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যী-আওয়ান নামক স্থানে তাঁবু খাটান, যেখান থেকে মদীনার দূরত্ব হলো এক ঘণ্টার পথ, তখন মুনাফিকদের দ্বারা নির্মিত এ মসজিদ সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (আত-তাওবা: ১০৭)

অর্থ: "আর (মুনাফিকদের) এক দল লোক যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে– (ইসলামের) ক্ষতিসাধন করার জন্য এবং কুফরী বিস্তারের লক্ষ্যে আর মুমিনদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করার নিমিত্তে। আর ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছে তাদেরকে একটি গোপন ঘাঁটি সরবরাহের লক্ষ্যে। আর তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, 'মহৎ উদ্দেশ্যেই আমরা এটি করেছি।' অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।"

মহানবী (সা.) এই ওহী অবতীর্ণ হবার পর হযরত মালিক বিন দুখশুম এবং হযরত মা'আন বিন আদী (রা.)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে 'মসজিদে যিরার' ধূলিসাৎ করার নির্দেশ দেন। কিছু রেওয়ায়েতে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আদী, হযরত আমের বিন সাকান এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হন্তারক ওয়াহশী আর সুওয়াইদ বিন আব্বাস (রা.)-কেও মহানবী (সা.) এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। 'শারাহ্ যুরকানী'-তে লেখা আছে, সম্ভবত মহানবী (সা.) প্রথমে দুইজন সদস্যকে প্রেরণ করেছিলেন আর পরবর্তীতে আরো চারজন সদস্যকে তাদের সহযোগিতা করার জন্য প্রেরণ করেন। যাহোক, মহানবী (সা.) তাদেরকে 'মসজিদে যিরার' অভিমুখে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন বলেন, সেটি ভূপাতিত করো এবং পুড়িয়ে দাও। সুতরাং তারা দ্রুত বনু সালিম গোত্রে পৌঁছান। হযরত মালিক (রা.) তার উভয় সঙ্গীকে বলেন, আমি তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করো। এরপর তিনি বাড়ি থেকে খেজুর গাছের শুকনো ডালপালায় আগুন লাগিয়ে নিয়ে আসেন। অতঃপর তারা মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে 'মসজিদে যিরার'-এর নিকটে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে তারা সেটিতে আগুন লাগিয়ে দেন এবং সেটিকে ধূলিসাৎ করে দেন। সেসময় সেখানে এই মসজিদ নির্মাতারা উপস্থিত ছিল, তবে আগুন লাগার পর তারা দিগ্‌বিদিক পালিয়ে যায়। মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছে এই জায়গাটি হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-কে দিতে চান যেন তিনি এই জায়গায় নিজের বাড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু আসেম বিন আদী (রা.) ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলেন, এই স্থান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যা অবতীর্ণ করার ছিল তা করেছেন; এটি এমন স্থান যেখানে আমি বাড়ি বানাতে চাই না আর আমার এর প্রয়োজনও নেই। আপনি এটি সাবিত বিন আকরাম (রা.)-কে দিয়ে দিন, কেননা তার কোনো বাড়ি নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই স্থানটি সাবিত বিন আকরাম (রা.)-কে দিয়ে দেন। ইবনে ইসহাক 'মসজিদে যিরার' নির্মাণকারী মুনাফিকদের নামও বর্ণনা করেছেন যারা সংখ্যায় বারোজন ছিল।

মহানবী (সা.)-এর সাগরসম দয়া, পাহাড়সম দৃঢ়তা এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহের একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হলো, প্রতিটি পদক্ষেপে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে; তাদের পক্ষ থেকে দুঃখ, যাতনা এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি পর্যন্ত হতে হয়েছে। মুনাফিকরা এসব ষড়যন্ত্র করেছে আর হাতেনাতে ধরাও পড়েছে। কিন্তু তিনি (সা.) সর্বদা, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। শুধুমাত্র সেখানে শাস্তি দিয়েছেন যেখানে তারা রাষ্ট্র ও ব্যবস্থাপনার প্রতি হুমকি ছিল; আর সেখানেও শুধু এতটুকু পর্যন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেন সে বিপদ দূর হয়ে যায়। নতুবা সেসব ক্ষেত্রেও কঠোর শাস্তি দেন নি, যদিও তা দেবার সুযোগ ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেন– কুবার সেই মসজিদ যা মুনাফিকরা এজন্য নির্মাণ করেছিল যে, নামাযের অজুহাতে সেখানে একত্রিত হবে এবং কপটতাসুলভ পরামর্শ করবে– সেটি যেন ধ্বংস করা হয় আর তাদেরকে যেন বাধ্য করা হয় যে, তারা মুসলমানদের অন্যান্য মসজিদে নামায পড়বে। কিন্তু এত বড়ো ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তাদেরকে কোনো শারীরিক বা আর্থিক শাস্তি দেওয়া হয় নি। [তিনি (সা.) তাদের সব কুকীর্তি জেনে গিয়েছিলেন।]

মহানবী (সা.)-এর মদীনা এবং আনসারের সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, প্রায় দুই মাস সফর করার পর মহানবী (সা.) মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন। মদীনা এবং এর অধিবাসীদের প্রতি তাঁর (সা.) ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এভাবে হয় যে, যখনই তিনি (সা.) মদীনার জনপদ দেখতে পেলেন তখন বললেন,

هذه طابة و هذا احد جبل يحّبنا و نحبّه

এটি তাবা, [তাবা মদীনার একটি নাম, এর অর্থ পবিত্র এবং উত্তম;] আর এটি উহুদ পাহাড়, এটি সেই পাহাড় যেটি আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরা এটিকে ভালোবাসি। অর্থাৎ মদীনার প্রতিটি স্থানের প্রতি তাঁর (সা.)-এর ভালোবাসা ছিল। আর এ দিকটিও রয়েছে, উহুদের নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে উহুদের যুদ্ধে সাহাবীরা নিজেদের রক্তের দ্বারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার যে উপাখ্যান রচনা করেছিলেন, সেটি তিনি (সা.) কখনো ভোলেন নি।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে দ্রুত মদীনা পৌঁছাতে হবে, এজন্য তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার সাথে দ্রুত যেতে চাও দ্রুত চল। অতঃপর এটিও বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আনসারের সর্বোত্তম গোত্রগুলো সম্পর্কে বলব? তখন সাহাবীরা বলেন, অবশ্যই বলুন। তখন তিনি (সা.) বলেন, বনু নাজ্জার গোত্র, এরপর বনু আব্দুল আশহাল, এরপর বনু সা'য়েদা অথবা বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্র; আর আনসারের সব গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন আবু উসায়েদ বলেন, তুমি কি জানো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারের সব গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদেরকে সবার শেষে রেখেছেন? হযরত সা'দ (বিন উবাদা) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আনসার গোত্রগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদেরকে সবার শেষে রেখেছেন। [অর্থাৎ যে প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছিল এতে সবার শেষে তাদের নাম এসেছিল। সাহাবীরা এটাও লক্ষ্য রাখতেন।] এতে হুযূর (সা.) বলেন, তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা উত্তম লোকদের মাঝে রয়েছ? [তোমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, তোমাদের নাম আমি বলেছি এবং উত্তম লোকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছি।]

যেমনটি শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবুক অভিযানে পিছনে থাকা দুটি বড়ো দলের মধ্যে একটি হলো মুনাফিকদের, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, আর অন্যটি হলো সেই সমস্ত লোকদের যারা নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হয়ত তারা এতটাই দরিদ্র ছিলেন যে, সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধে যাবার কোনো মাধ্যম ও উপকরণ জোগাড় করতে পারেন নি, অথবা কোনো অসুস্থতা বা অপারগতার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবার ৯১ ও ৯২ নম্বর আয়াতে তাদের অপারগতা গ্রহণ করেছেন।

বুখারীর একটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) তাবুক থেকে ফিরে যখন মদীনার নিকটে পৌঁছান তখন তিনি (সা.) বলেন, মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যে, যখনই তোমরা কোনো স্থানে সফর করেছ অথবা কোনো উপত্যকা অতিক্রম করেছ– তখন তারাও তোমাদের সাথে সাথেই ছিল। এটি শুনে সাহাবীরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা তো মদীনায় রয়েছে! অর্থাৎ তারা মদীনায় অবস্থান করে কীভাবে আমাদের সাথে থাকতে পারে? মহানবী (সা.) বলেন, তারা মদীনাতেই অবস্থান করছে আর অসুস্থতা ইত্যাদি কোনো না কোনো অপারগতা তাদের অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন মহানবী (সা.) তাবুক থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন:

الحمد لله على ما رزقنا فى سفرنا هذا من اجرّ و حسنة و من بعدنا شركاؤنا فيه

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি আমাদের এই সফরে আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান এবং পুণ্যে ভূষিত করেছেন, আর যারা আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকেও একই প্রতিদান ও পুণ্যে ভূষিত করেছেন। এটি শুনে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য সহ্য করেছেন, তারপর প্রতিদান ও পুণ্য লাভ করেছেন। কিন্তু এরা কোনো কষ্টবরণ না করেই কীভাবে আপনার সাথে প্রতিদান ও পুণ্যের ভাগীদার হলো? আর এরা কারা? তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যেখানেই গিয়েছি এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছি– মদীনায় থাকা কিছু লোকও আমাদের সাথে সাথেই ছিল। তাদের অসুস্থতা আমাদের সাথে যাবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তাদের মুজাহিদ এবং তারা ঘরে অবস্থানকারী আমাদের সঙ্গী। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তাদের দোয়া শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের অস্ত্রের চেয়েও অধিক কার্যকরী। তারা এখানে ঘরে বসে যেসব দোয়া করেছে, তা এমন দোয়া ছিল যা আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেছেন।

তাবুকের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনাবাসীদের ভালোবাসাপূর্ণ অভ্যর্থনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে মহানবী (সা.)-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মদীনার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁর (সা.) প্রতি গভীর ভালোবাসায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে মদীনার অদূরে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত চলে আসে এবং এই পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে থাকে:

طلعَ البدرُ علَينا مِن سنيّاتِ الوداعِ وجَبَ الشُّكرُ علَينا ما دعا للهِ داعِ

অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের ওপর সানিয়্যাতুল বিদার দিক থেকে উদিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোনো একজন আহ্বানকারী বাকি থাকবে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি উপরোক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ করে মদীনাবাসীদের এমন অকৃত্রিম উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উল্লেখ দুটি উপলক্ষ্যে পাওয়া যায়। একটি হলো মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন তখন, আর দ্বিতীয় উপলক্ষ্যটি হলো যখন মহানবী (সা.) তাবুক থেকে ফিরে মদীনায় প্রবেশ করছিলেন তখন। কতিপয় হাদীস ভাষ্যকারের, যেমন বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত হলো, খুব সম্ভব যেই পঙ্‌ক্তিগুলোর উল্লেখ হযরত আয়েশা (রা.) কতৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে রয়েছে, সেগুলো মহানবী (সা.)-এর তাবুকের যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরত আসার সাথেই সম্পর্কযুক্ত। কেননা সেই সময়ে

সানিয়্যাতুল বিদা নামক স্থানে লোকজন এবং ছোটো ছোটো শিশুরা মহানবী (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, কারণ সিরিয়ার দিক থেকে আগতদের এই স্থান থেকেই অভ্যর্থনা জানানো হতো। যখন মদীনাবাসীরা মহানবী (সা.)-এর তাবুকের যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরত আসার বিষয়টি জানতে পারল, তখন তারা আনন্দের আতিশয্যে মহানবী (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মদীনার বাইরে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে বের হয়, যেমনটি হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ (রা.) বর্ণনা করেন– আমার মনে আছে, আমিও অন্যান্য শিশুর সাথে সেই সময়ে মহানবী (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানাতে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম, যখন তিনি (সা.) তাবুকের যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরত আসছিলেন।

ইমাম বাইহাকীও এমনটি বর্ণনা করে বলেন, যখন মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরত আসছিলেন, শিশুরা মহানবী (সা.)-কে এই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। যাহোক, খুব সম্ভব এই দুটি উপলক্ষ্যেই পঙ্‌ক্তি পাঠ করা হয়েছিল আর তাবুক থেকে ফেরত আসার সময় এই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করার সম্ভাবনা বেশি, কেননা তাবুকের যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরত আসার সময় মদীনাবাসী আবেগের আতিশয্যে সাগ্রহে ও সানন্দে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁকে (সা.) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য (মদীনা থেকে) এগিয়ে এসে থাকবে। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এই যুদ্ধাভিযান এমন ছিল যার বিষয়ে মুনাফিকরা চতুর্দিকে বিভিন্ন রকম গুজব রটিয়ে রেখেছিল। যখন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের (রা.) জীবিত ফেরত আসার সুসংবাদ পাওয়া গেল, তখন যেভাবে মৃতপ্রায় মানুষ প্রাণে পানি ফিরে পায়, ঠিক সেভাবে এই আনন্দের উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানাতে মদীনার মুসলমানরা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলেই মদীনা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। যা-ই হোক, সম্ভবত মক্কা থেকে হিজরতের সময়ও এই পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করা হয়েছে, আর এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে থাকতে পারে। এই বিষয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। তবে এটি অবশ্যই প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসার যে গভীর উপলব্ধি মুসলমানরা লাভ করেছিল, সেটি নিঃসন্দেহে তাঁর (সা.) প্রথমবার হিজরতের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

আরো কিছু ঘটনা বাকি রয়েছে, জীবনীর আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে; সেগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)